Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 91 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 91 - 97
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্র : এক স্বতন্ত্র ঘরানার ঔপন্যাসিক

ড. রুক্সানা খাতুন
প্রাক্তন গবেষক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালায়
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাকির হোসেন দিল্লী কলেজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ruxana.khatun.du@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bhagirath Mishra, Unique Narrative, Cultural Context, Power Relations, Folk Elements

Abstract

Bhagirath Mishra's literature departs from traditional genres, introducing a narrative style infused with rural and folk elements to explore societal and human narratives. His work delves into the complexities of power dynamics, challenging conventional social theories by presenting power as both oppressive and oppressed, shaped by various factors like favorable context, location, culture, position, etc. Mishra seeks liberation from the deep-rooted power hierarchies, which he finds analogous to a food chain in power relations, aspiring to escape from the cycles of dominance. His novels appear to progress chronologically, with each story paving the way for the next, particularly in terms of power dynamics. For instance, the transition from 'Ontorgoto Neelsrot' (1990) to 'Mrigaya' (2000) illustrates an expansion of power's narrative from a confined space to broader, more intricate explorations. Bhagirath Mishra's literature marks a significant shift in the portrayal of power from traditional institutions such as religion, caste, and class to more contemporary political realms, set against the vivid backdrop of rural and folk settings. His narratives extend from rural and subaltern struggles to urban crises, presenting a universal view of power dynamics within specific local scenarios, mostly rural and marginal contexts. He enriches his stories with folk traditions such as rural magic, witchcraft, and superstitions, bringing fading folk practices back into contemporary discourse. This paper showcases Bhagirath Mishra's unique narrative style through a selection of his novels, illuminating the complex interplay between societal and individual experiences against a backdrop of power hierarchies. By offering a personal theory of power relations, reviving elements of folk culture, and delving into the detailed and dynamic complexities of marginalized and subaltern societies, Mishra distinguishes himself as a contemporary novelist with a distinctive approach, delving deeply into societal and personal power dynamics.

Discussion

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখক ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭)। আটের দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর লেখালেখি স্বতন্ত্র ঘরানার অন্বেষণে। অমর মিত্র এই ধারাটির প্রতি দৃষ্টি রেখেই বললেন,

> "আগের গল্পগুলি পড়তে পড়তেই টের পাচ্ছিলাম এই লেখক আলাদা। এই লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়ে লিখতে বসেছে।"[১]

সাহিত্য সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের কাছে ভগীরথ মিশ্র গৃহীত হলেন- 'যুগান্তরের অন্যতম পুরোধা নকিব হিসাবে'। প্রকাশিত উপন্যাস সম্পর্কে বললেন,

> "এখনো পর্যন্ত এই কটি উপন্যাসের মধ্যে আমরা ভগীরথের জীবনসন্ধান ব্যাক্ত হতে দেখেছি।"[২]

এযাবদ প্রকাশিত 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০), 'তস্কর' (১৯৯২), 'আড়কাঠি' (১৯৯৩), 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'জানগুরু' (১৯৯৫), 'মৃগয়া' (২০০০), 'শিকড়ের ঘ্রাণ' (২০০১), 'ফাঁসবদল' (২০০১), 'আরশিচরিত' (২০০৪), 'শিকলনামা' (২০১৪), 'অমানুষনামা' (২০১০), 'ঐন্দ্রজালিক' (২০১০), 'বাজিকর' (২০১৯), 'জাদুগর' (২০১৪)) উপন্যাসে উঠে এসেছে প্রতাপ সম্পর্কের নানাবিধ দ্বান্দিক প্রকৌশল। শোষণ ও আধিপত্যবিস্তারের কথা বলতে গিয়ে কোথাও কুণ্ঠিত হননি তিনি। মার্কসীয় দর্শন, বামপন্থী সংস্কৃতিতে আস্থাশীল মানুষটি এযাবদ জগৎ ও জীবন নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে। দেশজ ঘরানার আখ্যান রীতি তাঁর লেখনীর বয়ানে। পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ-অনুসরণ থেকে সরে এসে তিনি অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়ে নিজস্ব ধারায় লিখে চলেছেন। এ বিষয়ে লেখকের আকুতিটি উল্লেখযোগ্য,

> "বলতে পারো আর কতোদিন আমরা এ দেশে বসে ভারতীয় ভাষায় পশ্চিমি সাহিত্যের দাসত্ব করে যাব?"[৩]

এ যাবদ সমালোচকদের দৃষ্টিতে ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্যে দেশজ ঘরানার আখ্যানরীতি, দেশীয় রীতি-নীতি-প্রথা-সংস্কার, স্থানীয় উপকথার ব্যবহার, ভেষজ উদ্ভিদের চর্চা, লোকসংস্কৃতির চর্চা, দেশজ ভাষার ব্যবহার, স্থানীয় প্রবাদ ব্যবহারের দিকটি বিশেষভাবে আলোচিত হতে দেখা গেছে। বেশ কিছু গবেষক এ বিষয়ে নিজেদের আহরিত অনুসন্ধান অভিসন্দর্ভ রূপে জমাও করেছেন। মার্কসবাদী ভাবধারার আদর্শে আস্থাশীল সাহিত্যিকের সাহিত্যে শ্রেণীশোষণ আসার স্বাভাবিকতা নিয়েই এযাবদ বেশ কিছু বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক উচ্চ বর্গ/বর্ণের আলোকে শ্রেণী শোষণের দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্য চর্চার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি হল, দেশজ রীতিতে খাদ্যশৃংখলের অনুরূপে দেখেছেন সামাজিক শোষণ কাঠামোকে। গ্রাম তাঁর লেখায় গ্রামের মতো করেই উঠে আসে, নাগরিক কোন লেখককে নিজের লেখা পড়তে দিয়ে তাই সতর্ক করে বলেন,

> "একটু দেখে শুনে পড়বেন ভাই, গ্রামের মানুষ চিরিক করে থুথু ফেলবার বেলায় থুথুর সঙ্গে আরো অনেক কিছু ফেলে দেয়, গাঁয়ের মানুষের 'হাই বাপ' এর ছটা মানে হয়।"[৪]

তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাহিত্যের পটভূমি, ভাষা, চরিত্র, হয়ে ওঠে স্থান-কালের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। গ্রাম, শহর, নগর, সমষ্টি ও ব্যক্তি ভিত্তিক শোষণ কাঠামোর জটিলতার মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে– এ বিষয়েও লেখক সচেতন। মানুষ লেখকের ভাবনায় 'জটিল কলকব্জা সম্পন্ন প্রাণী'। প্রতাপ সম্পর্ক চর্চা লেখকের ভাবনায় স্থান পেয়েছে 'খাদ্যশৃংখলের' অনুরূপে। জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এই শৃঙ্খলের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করেও লেখকের শোষণমুক্ত সমাজের জন্য আকুতি দেখা গেছে সর্বত্র। তিনি বলেছেন –

> "মানুষ সহ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ কেমন করে ওই শোষণ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, এই প্রশ্ন অহরহ আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এই শোষণ শৃঙ্খলটির প্রসঙ্গ আমি আমার একাধিক লেখায় উত্থাপন করেছি। এর জবাব আমি খুঁজে চলেছি।"[৫]

এযাবদ শাসক ও শোষিত এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে শ্রেণী শোষণ কাঠামোটি। এই ধারার প্রথম সাহিত্যিক হলেন ভগীরথ মিশ্র যিনি খুব সচেতনভাবে একক ব্যক্তির মধ্যেই স্থান বিশেষে উপস্থাপন করলেন শাসক ও শোষিত সত্ত্বাটিকে। লেখকের ভাবনায় –

> "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রাজা মহারাজা ভাবটি লুকিয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশে তিনি চোখ মেলেন।"[৬]

প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০) পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল খুব সচেতনভাবে ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের বহুস্তরীয় ভূমিকা বলবেন বলেই যেন তিনি সলতে পাকাতে শুরু করেছিলেন এখান থেকেই। ক্ষমতার রক্তের রঙ তাঁর ভাবনায় নীল। লাল শোষিতের রক্ত, আর নীল শোষকের। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে এই দুই রক্তের সহাবস্থান। স্থান কাল পাত্রের আনুকূল্যে চোরা নীল রক্তের স্রোত বইতে শুরু করে ভিন্ন খাতে। কলকাতা থেকে মেদিনীপুরগামী রাইটার্সে পিয়নের পদে কর্মরত গুরুপদর আধিপত্যবিস্তারের চিত্রটি কীভাবে স্থান বদলের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে শুরু করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন একের পর এক ঘটনা তুলে এনে। স্ব-গ্রামে আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ সদস্যটির মধ্যে প্রতাপের নীলস্রোত কীভাবে রাইটার্সের পিয়নের মধ্যে জমে হিম হয়ে আসে তার নিখুঁত বর্ণনা উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে। গ্রামে পৌঁছেই যে গুরুপদ নিজের ভারি ব্যগখানা বহন করার ত্রুটি নিয়ে 'লদকা' ও 'কানফুরি'কে কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার করেছে, সেই গুরুপদই সোমবার দুপুর একটাই রাইটার্সের বড়োবাবুর পারিবারিক প্রয়োজনের সামগ্রী একতলা থেকে তিন তলায় বইতে গিয়ে –

> "কাঁধটা টন টন করছিল গুরুপদর। হাত দুটোতে প্রবল টান পড়েছে। ফুসফুস হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। এই বয়সে এতো বোঝা নিয়ে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙতে রীতিমতো কষ্ট হয়। পা এলিয়ে পড়ে মাথা ঝিমঝিম করে।"[৭]

শনিবার দুপুর থেকে সোমবার দুপুর একটা, এই স্বল্প সময় পরিসরে উপন্যাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটাতে বাড়ি যাওয়া গুরুপদ, আর বাড়ি থেকে ফেরার পরে অফিসের পিয়ন গুরুপদর স্থান বিশেষে শাসক ও শোষিতের ভূমিকায় সম্পর্ক পরিবর্তন হতে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক 'অন্তর্গত নীলস্রোত' উপন্যাসে। গ্রামীণ কাঠামোয় প্রতিপত্তিশীল আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ সদস্যটি কোন এক অজানা মন্ত্রে রাইটার্সে পা দিতেই তার শরীরের তামাম উষ্ণ নীল রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে ভিন্ন পথে। সপ্তাহের সাড়ে পাঁচদিন সে একইভাবে মাথানত করে কাজ করে যায়, ফাই ফরমাশ খেটে যায় বাকি সবার, তাতে তার প্রতি থাকেনা কারো বয়সজনিত কোনও সমীহা। গুরুপদর মধ্যে অবমাননা উঁকি দিলেও সে তাকে দাবিয়ে রাখে। বারেকের তরেও ঝুলি হতে বেরোতে দেয়না। তার আধিপত্যের ঝুলি খুলতে শুরু করে শনিবার রাইটার্স থেকে বেরিয়ে সুযোগমতো ট্রেনে-বাসে, সুবিধার ভরে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। ট্রেন সময়ে ছেড়ে দিলে 'এই পাংচুয়ালিটির' জন্য বেধড়ক পেটাতে ইচ্ছে করে। আবার ট্রেন ছাড়তে দেরি হলেও একই ভাবে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে। ট্রেনে উঠতে চায় সবার আগে নামতেও চায় সবার আগে, দুটোর জায়গায় তিনটে সীট দখল করে। বসতে ঠিক মতো জায়গা না পেলে সহযাত্রীকে দেয় সহযোগীতার ভাষণ। আর এভাবেই সদস্যটি পৌঁছে যায় নিজের গ্রাম যমুনায়, আর সেখানেই তার ঝুলি থেকে আচমকা সবেগে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসে আধিপত্যের বেড়ালটি, যার নখ ও দাঁতের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে ওই পরিবেশে সম্মান ও মর্যাদাগত দিক হতে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা।

'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০) উপন্যাস প্রকাশের পাঁচ বছর পর পাঁচ খন্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'মৃগয়া' উপন্যাসটি। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। তার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে তস্কর (১৯৯২), আড়কাঠি (১৯৯৩), চারণভূমি (১৯৯৪) ও জানগুরু (১৯৯৫)। লেখকের বাকি উপন্যাস পড়তে গেলে পাঠকদেরও সলতে পাকাতে হয় উক্ত প্রথম উপন্যাসটিকে দিয়েই। তিনি পরবর্তীতে কী বলবেন বা বলতে চাইছেন তার গৌরচন্দ্রিকা উক্ত উপন্যাসটি। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শাসক শোষিতের সম্পর্ক বদল যে শুধু গুরুপদর মতো রাইটার্সের পিয়নের পদে অধীন মানুষদের ক্ষেত্রেই হয়না, এর ব্যপ্তি যে সর্বত্র সেটি দেখা গেল তাঁর 'মৃগয়া' উপন্যাসে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের এক প্রচণ্ড দাপুটে জমিদার, যার দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। অনুকূল প্রতিকূল স্থান বিশেষে সেই মানুষটির ভূমিকাও পালটে যেতে দেখা যায় উপন্যাসে। শহুরে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সামনে বাঁকড়ি ভাষায় কথা বলতে গিয়ে 'গুটিয়ে এসেছে জিহ্বার অগ্রভাগ'। কৃষিবর্গের মানুষ হিসাবে শহুরে উত্থিত ধনিক সম্প্রদায়ের কাছে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন হীনমন্যতায় ভুগেছে চরিত্রটি। নিজের ভাষা ও অবস্থানগত দিক থেকে এক ধরণের অসহায়তার মধ্যে থেকেছে ঐ পরিবেশে। আবার এই জমিদার সুদর্শন সিংহ যখন ঐ পরিবেশ থেকে পা বাড়িয়েছে বাড়ির পথে,

> "গোরুর গাড়িতে উঠে যখন পুরোপুরি গ্রাম্য পথ ধরলেন, চারদিকে ঝোপ, জঙ্গল, টিলা – ডুংরি, ক্ষেত জলা ডাঙ্গা ডিহর ... এমন সব অনুষঙ্গ যতোই বাড়তে থাকল, ততোই যেন তিনি নিজেকে ফিরে পেতে লাগলেন একটু একটু করে। তারপর সোনামুখী কিংবা হেরে পর্বতের জঙ্গলে ঢুঁকে জঙ্গলের আদিম ঘ্রাণ নিতে নিতে একসময় তিনি হয়ে

> উঠলেন এক পরিপূর্ণ সাবালক বাঘ। তখন বাঘের ঝাপট নিতে লাগলেন কথায় কথায় গাড়োয়ান লগদী কর্মচারীদের উপর।”[৮]

আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিচিতির সাথে সাথে ব্যক্তির অনুকূল প্রাথমিক পরিচিত স্থানও যে প্রভাববিস্তারের অন্যতম সহায়ক মাত্রা হতে পারে তা ভগীরথ মিশ্র আমাদের দেখিয়েছেন সুদর্শন সিংহের একমাত্র কন্যার জামাতা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী চয়ন সূত্রে সুদর্শন সিংহ শেকড় উপড়ে এনেছে শংকরপ্রসাদকে। সুদর্শন সিংহ মনে করত যে মানুষ যতো বেশি অস্তিত্ব সংকটে ভুগবে তার উপর আধিপত্যবিস্তার ততোই সহজ হবে। শংকরপ্রসাদের মধ্যে মায়া-মমতা ন্যয়-নীতির, মানবিক দিকগুলি যতো বেশি বেশি করে সামনে এসেছে, জমিদার সুদর্শন সিংহ নিজের অবস্থান থেকে ততোই বেশি বেশি করে নির্মম হয়ে উঠেছে শংকরপ্রসাদের প্রতি। একমাত্র কন্যা লাবণ্যর সঙ্গে শংকরপ্রসাদের সুখী হওয়ার দৃশ্য নানাভাবে বিচলিত করেছে চরিত্রটিকে। তার ধারণায় জগতে যারা একমাত্র নারীতে সুখী তারা শুধুই গৃহস্থ, জমিদারি পরিচালনার ক্ষমতা তাদের নেই। বাবা শংকরপ্রসাদের শেকড়হীনতার অস্তিত্ব সংকটের রেশ চাড়িয়ে যেতে দেখা গেছে নাতি প্রিয়ব্রতর মধ্যেও। নিজেকে ঘিরে কোকিলের প্রবাদ শুনতে শুনতে বড় হয়ে ওঠা প্রিয়ব্রত দাদু সুদর্শন সিংহ ও তার সম্পত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে ‘জলাতঙ্ক রুগীর’ মতো করে। পরবর্তীতে তার এই বৈরাগ্য গা ভাসিয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায়। শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি মানুষের সংকট নয়, ব্যক্তি মানুষের সংকট, মতাদর্শ দ্বারা কীভাবে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাবিত হয়, একের পর এক ব্যক্তি জীবনের হতাশা, হীনমন্যতা তাদের জীবনের অপ্রাপ্তি - স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক মতাদর্শকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছে তা নিপুণভাবে দেখালেন একের পর এক চরিত্র ও ঘটনা তুলে এনে। উপন্যাসে নিম্নবর্ণীয় চরিত্র গোরা, বাবুভাইদের গায়ের রঙ নিয়ে জন্মেছে, নিজের সমাজে এই নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শিকার সে। মা, সৎ বাবা তিলক, আর সৎ ভাইয়ের ছোট ছোট সুখের মূহুর্ত গুলো ভেতর থেকে দগ্ধ করেছে তাকে, যার অন্তর্জ্বালা নেভাতে গোরা যোগ দিয়েছে নকশাল পার্টিতে। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নয় ব্যক্তিগত হতাশা, অবসাদ, ও পরবর্তীতে স্বার্থভিত্তিক অবস্থান, ক্ষমতালিপ্সা কীভাবে গ্রামবাংলার রাজনীতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে তার নিখুঁত উপস্থাপন রয়েছে ‘মৃগয়া’ উপন্যাসটিতে।

বিগত একশো বছরেরও বেশি সময় কাঠামোয় ডকুমেন্টেশন পদ্ধতিতে রচিত মহা উপন্যাসটিতে রয়েছে সময়ের দলিলে মানবের মৃগয়াবৃত্তি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় হতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্বের রাজনৈতিক পরিমন্ডলের চড়াই উৎড়াইয়ে বাংলার ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের জীবনে পরিবর্তিত সময়ের প্রতাপ কাঠামোয় সমাজ ও মানুষের ভূমিকাকে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস পার্টি লেখকের কাছে গৃহীত হয়েছে ‘বড়লোকের পার্টি’ রূপে।

> “যে রাজা-রাজড়া, জমিদার সামন্তদের শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সাত মণ তেল পুড়িয়ে প্রজাতন্ত্রের পত্তন হল, এই মজার কলটিতে পড়ে প্রজারা তাদের সেই চির শত্রুদেরই নির্বাচিত করে পাঠিয়ে দিচ্ছে সংসদে। ... প্রজাতান্ত্রিক এই দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদের যে নির্বাচন হয়, তাতে মোট সাংসদের নব্বই ভাগ রাজা-জমিদার সামন্ত কেন? কেমন করে তারাই মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠলো? এদের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্যই তো শাসন ব্যবস্থায় এতো রদবদল, প্রজাতন্ত্রের পত্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধির হাতে শাসন ব্যবস্থা তুলে দেবার এতো মহার্ঘ্য আয়োজন।”[৯]

সময়ের ঘাত প্রতিঘাতে অবদমিত মানুষও সময় সুযোগ অনুযায়ী একসময় আশ্রয় নেয় ভিন্ন মতাদর্শের। এই ভিন্ন মতাদর্শের আশ্রয় হিসাবে পশ্চিম বাংলায় সর্বহারা মানুষের রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় এলে – লেখক ঐ রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বুঝে নিতে চেষ্টা করলেন নিম্নবর্ণীয় ও নিম্ন বর্গীয় গ্রামীণ মানুষের অবস্থান প্রতাপ সম্পর্কে। বিশেষত তিরাশির নির্বাচনের পর সুকুমার বুঝতে পারে সময়ের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। প্রধান বাঁশি বাউরির বামফ্রন্ট আদর্শ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ জেনেও চুপ থাকতে হয় সুকুমারকে। তার সম্পর্কে বাঁশি বিরূপ মন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ ও পার্টির কাছে। বাঁশি বাউরি বলে,

> “পার্টি করুক আর যাই করুক সুকুমার আচায্যি তো আসলে উচ্চ বংশের সন্তান। জাতে বামনা সে। গরীব গুরবোদের দুঃখ কষ্ট সে কী আর ষোল আনা বুঝতে পারবেক?”[১০]

জনদরদী পূর্ব প্রধান সুকুমারের কোন কাজ মনঃপূত না হলেই সেটিকে ধনী গরীবের পার্থক্যের মোড়কে উপস্থাপন করে বাঁশি বাউরি। কারণ বাঁশি বাউরি জানে, বর্তমান অবস্থায় যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে সেখানে উচ্চবর্ণের সুকুমার নয় শ্রেণীগত সুবিধাভিত্তিক অবস্থান রয়েছে তারই। সুকুমার হয়ে যাচ্ছে কোণঠাসা, 'ডানাকাটা পাখি'। ঔপন্যাসিক পরিচ্ছেদটির শিরো নাম দিয়েছেন 'বাঘের বদলে খোগ'। উপন্যাসটিতে রয়েছে আটটি পর্ব, এবং দুশো আশিটি পরিচ্ছেদ। পর্বগুলি হল, 'পীড়নপর্ব', 'দহনপর্ব', 'খননপর্ব', 'লুণ্ঠনপর্ব', 'মন্থনপর্ব', 'ধর্ষণপর্ব', 'বপনপর্ব', 'সর্জনপর্ব'। পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলি যেমন 'গোবর থেকে ঘুঁটে হওয়ার পদ্ধতি', 'ঘুটে পুড়িয়ে ধোঁয়া তৈরি', 'আশায় মরে চাষা', 'নাকের বদলে নরুণ', 'গরিবের বাপের ঠিক নাই', 'শিকড়হীনতার দ্বিতীয় কিস্তি', 'কুকুর কেন লেজ নাড়ায়', 'কুমড়ো লতায় জালি', প্রভৃতি। পর্ব ও পরিচ্ছেদগুলির নামকরণের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে দেশজ ঘরানার শব্দ ও প্রবাদের ব্যবহার, তেমনই দেশজ গ্রামীণ জটিলতায় নামকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে শ্রেণী বৈষম্যজনিত শোষণ জটিলতা।

প্রত্যেক সমাজেই প্রতাপ কাঠামো রয়েছে, তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে তার ভিন্নতা অনুধাবনযোগ্য। বর্তমান সময়েও প্রথম বিশ্বের দেশগুলির থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে যেমন প্রতাপ সম্পর্ক উপস্থাপনের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে, তেমনই উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও গ্রাম ও শহর ভিত্তিক প্রতাপ সম্পর্কের মধ্যেও পাওয়া যাবে বৈচিত্র্য। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বর্তমানেও অর্থের পাশাপাশি খুব সচতনভাবে বিরাজ করছে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থা। আর বিংশ শতক থেকে প্রতাপের অন্যতম মানদণ্ড হিসাবে যুক্ত হয়েছে দলীয় রাজনীতি। সামন্ত, বুর্জোয়া, আমলা ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পরিসরে প্রতাপ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রকের মধ্যেও এসেছে বৈচিত্র্য যা ভারতীয় সমাজ কাঠামোর আত্যন্তিক বইশিস্থ্যের সাথে যুক্ত, যাকে বিশ্বের অন্যান্য অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশের সাথে এক করে দেখা যেতে পারেনা। একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বর্তমান সময়েও জড়িয়ে আছে পারিবারিক মূল্যবোধ। সম্পর্ক, বয়স, অভিজ্ঞতা, সম্বোধন ইত্যাদি প্রতাপ সম্পর্ক কাঠামোয় যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর কিছু মানুষ গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক ক্ষমতায় এলে তাদের মধ্যেও পূর্বের শোষিত সত্তা কিভাবে শোষকে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিকটি লেখক যেমন উপস্থাপন করেছেন তেমনই সম্মানলিপ্সা কীভাবে মাথা চারা দিয়েছে তাদের মধ্যে সেটাও দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন পার্টি অফিসে এতোদিন বাঁশি বাউরি, গুরুপদ এর মতো মানুষেরা যেমন আপনি আজ্ঞে করে মাথা নত করে এসেছে, পরবর্তীতে ক্ষমতার কেন্দ্রে এলে একইভাবে সে নিজেও আদায় করে নিতে চেয়েছে সেই সম্ভ্রম, তাই বাপের চাইতেও বয়সে বড়ো কুঞ্জ বাউরী বাঁশি বাঁশি বলে ডাকলে তাকে ধমক দিয়ে বলেছে– "কি বাঁশি বাঁশি করছো সন্মান দিয়ে কথা বলতে পারক লাই"। সম্বোধন ও মর্য্যাদার যে পারস্পারিক সম্পর্ক গ্রামীণ কাঠামোয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে তা প্রতাপ কাঠামোর সঙ্গে কীভাবে নেতিবাচকতার সূত্রে সম্পর্কযুক্ত তা বাঁশি বাউরির চাহিদার অভিব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত। ভগীরথ মিশ্র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন 'তুই! তুই! তুই!'। পূর্বের জোতদার মানুষদের বর্তমানে বাঁশি বাউরিরা তু সম্বোধনের দ্বারা মানহরণের মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নিতে চাইছে অন্তর্জ্বালা। বাংলা সাহিত্যে এই সম্বোধন সূত্রে মর্য্যাদা প্রাপ্তি ও মর্য্যাদা হ্রাসের দিকটি সচেতন লেখকদের লেখনীতে ধরা পড়েছে। ভগীরথ মিশ্রের অভিব্যক্তিতে মর্য্যাদা সম্ভ্রম অভিজাত মানুষের কাছে 'দামি সাবানের মত'। প্রসঙ্গক্রমে মনে আসে 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে দেবু ঘোষের কথা, যেখানে কানুনগো তাকে বার বার 'তু' সম্বোধন করলে দেবুর ক্ষিপ্ত হবার দিকটি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলে ধরেছেন। বয়সে ছোট হলেও জেল ফেরত দেবুকে খুড়ো জ্ঞানে ছিরু পালের প্রণাম করার দিকটি যথেষ্ট আত্মতুষ্টি এনে দিয়েছে দেবুকে। নীলু বায়েনের পদবী পরিবর্তন, ছিরু পালের পদবী পরিবর্তনের চেষ্টা, পাল থেকে ঘোষ, এবং ঘোষের সাথে যোগ করতে চাওয়া মশায় অভিধা, বাঁশি বাউরির আভিজাত্য প্রাপ্তির ক্ষিদে, বাংলার ক্ষমতার ইতিহাসে এক ভিন্ন জটিলতার সন্ধান দেয়, যা অগ্রসর শিক্ষিত প্রথম বিশ্বের দেশের থেকে ভিন্ন মাত্রার।

একদিকে যেমন 'মৃগয়া' উপন্যাসে উঠে এসেছে একটি সমাজের সামগ্রিক প্রতাপ কাঠামো, তেমনই অন্যদিকে ভগীরথ মিশ্রের বাকি উপন্যাস হয়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী শোষণের দ্যোতক। সংখ্যালঘু সমস্যা, উদবাস্তু জীবন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা, পারিবারিক রাজনীতি, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি চর্চা, জাতি ও বর্ণব্যাবস্থা, বর্ণীয় পেশাভিত্তিক সংকট, অমানুষদের জীবনাখ্যান, জাদুবিদ্যার ইতিহাস –এর অধ্যয়নে প্রতাপ সম্পর্কচর্চা। এযাবদ যা ভিন্ন ভিন্ন

পরিসরে বহুস্তরীয় প্রতাপ সম্পর্ক চর্চা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছে। শিকলনামা উপন্যাসে উঠে এসেছে গ্রাম জীবনের বহুস্তরীয় পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা। উপন্যাসে সুন্দরী ভাতৃবধূটি বড় ননদের ষড়যন্ত্রের শিকার। লেখকের কথায় –

> "হীনমন্যতা মানুষের মনে তৈরি করে বিদ্বেষ।"[১১]

নিজের অধিকার পাকা করতে শিকড় চাড়াতে দিলনা নব বধূটিকে।

> "চিরকাল আঘাত পেয়ে আসা মানুষেরা সাধারণত অন্যকে আঘাত করতে ভালোবাসে।"[১২]

আড়কাঠি উপন্যাসে রাজীবের মতো পরোপকারী গবেষকও এক সময় বসু শবরদের আড়কাঠি হয়ে ওঠে। তপোধীর ভট্টাচার্য রাজীব সম্পর্কে বলেছেন,

> "রাজীবদের মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে লোকসংস্কৃতির চর্চা স্বভাবজাত ও স্বতস্ফূর্ত নয়। এটা তার মত মানুষের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান মাত্র।"[১৩]

রঙলাল বসু শবর মেয়েদের দারিদ্র্যের সুযোগে পাচার করে আসামের চা বাগানে। রাজীব তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে একসময় সমভাবে তাদের সংস্কৃতি ও তাদের পণ্যায়ন করে বিশ্ব পুঁজির কাছে। 'তস্কর' উপন্যাসে বাণেশ্বর ঘোষালদের মতো মানুষ যারা দিনের আলোয় চোরদের উলটো টাঙ্গিয়ে রাখে বিচারের আসনে, রাতের অন্ধকারে তাদের দিয়েই চুরি করায়। গোক্ষুর ভক্তরা চুরি করতে না চাইলে গভীর ষড়যন্ত্রে এনকাউন্টার করা হয় তাদের। দিনের রক্ষকরা কীভাবে হয়ে ওঠে রাতের ভক্ষক, সমাজের ক্ষমতাশীল সেই সমস্ত মানুষের চিত্র উঠে এসেছে 'তস্কর' উপন্যাসে। জানগুরু বিদ্যা চর্চার আড়ালে ধর্ষিত গৃহবধূর করূণ চিত্র উপস্থাপিত 'জানগুরু' উপন্যাসে। জানগুরুদের দ্বারা নির্দিষ্ট পোড়ো জায়গাকে করে তোলা হয়েছে রহস্যঘেরা। যেখানে সমাজের অসৎ ব্যক্তিরা নিজদের কুকর্ম সেরেছে। নাগরিক জীবনে বৈশ্বায়নের কদর্যপ্রভাবের শিকারগ্রস্থ নারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে 'আরশিচরিত' উপন্যাসটিতে। লেখক বার বার পরিসংখ্যান তুলে দেখাতে চেয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের নারীদের সৌন্দর্য প্রতিযোগীতায় প্রথম হবার দৃশ্যের রাজনীতিটিকে, প্রথম বিশ্বের দেশের তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলের ষড়যন্ত্রকে প্রতিবিম্বিত করেছেন উপন্যাসটিতে। সামাজিক মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত প্রাণীজগতের প্রতি সহমর্মী তাঁর মানবিক সত্তা ব্যথিত হয়েছে 'অমানুষনামা' উপন্যাসে। লেখক কল্পনা করেছেন সমস্ত প্রাণীজগত মিলে এর প্রতিশোধ একদিন নেবে। লেখকের এই দূরদৃষ্টি যে কতো বাস্তবসম্পন্ন তা করোনা (Covid-19) এর প্রকোপ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

এযাবদ প্রকাশিত সাহিত্যে নানা ভাবে মানুষ ও ব্যক্তি মানুষের, প্রবৃত্তিজাত শোষণস্পৃহাকে যেমন তুলে ধরেছেন দেশীয় ঘরানার নিজস্ব কাঠামোয় তেমনই আস্থাও রেখেছেন মানুষের প্রতি। তাঁর ভাবনায় মানুষ গড়তে হবে আগে। এ প্রসঙ্গে হারান সরকারের উপলব্ধি,

> "খুব অদ্ভুত একটি দেশে, এক অদ্ভূত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মার্কসবাদের প্রয়োগ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। যে দেশের বারোয়ানা মানুষ নিরক্ষর, চেতনার স্তর একেবারেই তলানিতে। চারপাশে সীমাহীন দারিদ্র্য, তার উপর হাজার হাজার বছরের ধর্ম ও কুসংস্কার তাদের চেতনাকে একেবারে গ্রাস করে রয়েছে। এমন একটি দেশে ভোটভিত্তিক রাজনীতি করবার পাশাপাশি মার্ক্সবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানো যে কী কঠিন ব্যাপার।"[১৪]

সুকুমারের মত আদর্শ জনপ্রতিনিধি আসে ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্যে, শুরু করে মানুষ তৈরির কুটুমকাটাম। সুকুমার গোটা পঞ্চাশেক 'মানুষ' উপহার দিতে চাই এই সমাজকে, যাদের প্রত্যেকে আরো পঞ্চাশজন করে গড়ে তুলবে সুস্থ চেতনা সম্পন্ন মানুষ। শেষ বয়সে কিছু অনাথ শিশুদের নিয়ে শুরু করে পাঠশালা আর সেখানে তাদের মানব ও পশুর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝিয়ে 'মানুষ' শব্দটার মধ্যে যে অতুল বিস্ময় নিহিত আছে তা বোঝাতে চেষ্টা করে। সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিব্যাক্তি,

> "সমাজ কথাটির মূল কথা হইল্যাক, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। একে অপরের দুঃখে কাদবেক, অন্যের বিপদে ঝাপাই পরবেক, দুনিয়ার যা কিছু সম্পদ নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে করে ভোগ করব্যেক, দশ জনার খাদ্য-খাবার ছলে বলে কৌশলে ছিনিয়ে লিয়ে খাব্যেক নাই। তাকেই বলি সমাজ।"[১৫]

ভগীরথ মিশ্র তাঁর অধ্যয়নে দেখালেন ক্ষমতা প্রয়োগ মানুষের জন্মগত বা সহজাত প্রবণতা, এবং সামাজিক কাঠামো সেই প্রবণতাকে পুষ্ট করে চলে প্রতিনিয়ত স্থান-কাল-পাত্রভেদে। ক্ষমতার ধারায় তাঁর এই অনুসন্ধানের পরেও লেখক শিক্ষা ও

চেতনার দ্বারা গড়তে চেয়েছেন মানুষ এবং আশা রেখেছেন এই মানুষের দ্বারাই সামগ্রিক প্রতাপ কাঠামোর ইতিবাচক ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভবপর হবে একদিন।

Reference:

১. মিত্র, অমর, 'তীরভূমিতে ফিরে আসা', সম্পাঃ সমীরণ মজুমদার, অমৃতলোক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৭২
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস: তত্ত্বরূপ ও প্রয়োগসূত্র', 'উপন্যাসের বিনির্মাণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৬৬
৩. ভট্টাচার্য, শ্যামল, 'আলাপচারিতাঃ ভগীরথ মিশ্র', সম্পা : সমীরণ মজুমদার, অমৃতলোক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৪৯
৪. মিশ্র, ভগীরথ, 'হোসেন সোহারাব ও দত্ত সুকান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার', অমৃতলোক পত্রিকা, ১০৬ সংখ্যা, পৃ. ৩২৯
৫. মিশ্র, ভগীরথ, উদ্ধৃতি: শ্যামল ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৩৭
৬. মিশ্র, ভগীরথ, 'মৃগয়া', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ৮৪
৭. মিশ্র, ভগীরথ, 'অন্তর্গত নীলস্রোত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ১০২
৮. মিশ্র, ভগীরথ, 'মৃগয়া', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ১২
৯. তদেব, পৃ. ২৮৯
১০. তদেব, পৃ. ৬০১
১১. মিশ্র, ভগীরথ, 'শিকলনামা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৮৬
১২. তদেব, পৃ. ১০৬
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'উপন্যাসের বিনির্মাণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৭৮
১৪. মিশ্র, ভগীরথ, 'মৃগয়া', প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ৯৪৫
১৫. তদেব, পৃ. ১০৭২